অধ্যায় ১০ : ব্যঞ্জনশিল্প ও মিষ্টান্ন

দেশভেদে, কালভেদে মানুষের খাদ্যাভ্যাস পৃথক হয়। স্থানিকতা বিশেষত অঞ্চল এবং ভৌগোলিক পরিবেশ ব্যক্তির খাদ্যাভ্যাসের স্বাতন্ত্র্য এনে দেয়। খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ধর্মবোধ, শুচিতা, বিশ্বাস-সংস্কার, প্রথা-আচার, ট্যাবু মানুষের খাদ্যাভ্যাসের বিশেষত্ব নির্ণয় করে। বাংলাদেশ নদী-নালা-খাল-বিল ডোবা-পানার দেশ। উর্বর মৃত্তিকার দেশ। ভূমিরূপের বৈচিত্র্য থাকলেও নিম্ন জলাভূমি এবং উর্বর গাছ গাছালিতে ভরপুর জীববৈচিত্র্য বাংলাদেশকে রূপসী বাংলা করে তুলেছে। নানা প্রাকৃতিক সম্পদ, শস্য সম্পদ, সবুজ শবজি, ফল-মূলে পূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশ। আর পুকুর ডোবা নদী-নালায় টইটম্বুর বিপুল মৎস্য সম্পদ।

কবিকঙ্কণের কাব্যে মধ্যযুগের ব্যঞ্জনশিল্পের পূর্ণরূপ প্রকাশিত। কাব্যে ঋতু প্রধান বাংলাদেশের ঋতুতে ঋতুতে রন্ধন ক্রমের বৈচিত্র্য ধরা পড়েছে। ভোজনপটু শিব ‘গণেশের মাতা’কে নিম শিম এবং বেগুনের তিত রান্না করতে বলেছেন। আবার শীতের দিনে শুকতার রান্না যে রসনায় বিশেষ আস্বাদ নিয়ে আসে শিব তা জানিয়েছেন। শীলিত ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক পরিবেশ পরিমণ্ডলে এমন নিরামিষ আয়োজন স্বাভাবিক। শাক-সবজি এবং মাছের প্রাচুর্য এখানে অনেক। আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থানের পার্থক্য ব্যঞ্জনের বৈচিত্র্য এনে দেয়। কালকেতুর মাতা নিদয়া এবং পত্নী ফুল্লরা অপাংক্তেয় ব্রাত্য জন-জাতির প্রতিনিধি রমণী। অপরপক্ষে লহনা, খুল্লনা বণিক রমণী। উভয় জাতির জীবনরুচি, রন্ধন, খাদ্যাভ্যাস এবং সাধভক্ষণের পার্থক্য দেখিয়েছেন কবিকঙ্কণ। বর্ণনা একান্তই বাস্তব। সামাজিক চড়াই-উতরাইকে নিরাসক্তভাবে রূপ দিয়েছেন মুকুন্দরাম। খাদ্যাভ্যাসের ইচ্ছে, প্রাপ্তি, আর্থিক সীমাবদ্ধতাকে সামাজিক অবস্থানের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে অভ্যেস করেছেন চরিত্রগুলি। মুকুন্দরামের সৃষ্টিতে এক্ষেত্রে কোনো অস্বাভাবিকত্ব নেই। যথার্থই মুকুন্দ বাস্তববাদী কবি।

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালিরা খাওয়ার সময় ব্যঞ্জনের ক্রম অনুসরণ করে খেতে শুরু করেন। আজও এই রীতি কৃষিভিত্তিক গ্রামসমাজের পল্লীতে পল্লীতে মেনে চলা হয়। এটি হলো বাংলাদেশের খাদ্যাভ্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ক্রম। প্রথমে তেতো, তারপর ভাজা, ডাল, শাক-সবজি, মাছ, মাংস এবং শেষে টক। আমাদের জিহ্বার স্বাদকোরকের গঠনও এমনি। প্রাচীনকালে যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির এমন উন্নতি ছিল না, তখন লোকায়ত মানুষ ব্যঞ্জন গ্রহণের ক্রম এভাবেই নির্বাচন করেছেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও প্রথম সুক্তা এবং শেষে অম্বল দিয়ে ব্যঞ্জনের ক্রম সম্পূর্ণ করেছেন কবি।

বাঙালির ব্যঞ্জন এক বড় বিস্ময়। ব্যঞ্জন শিল্প কিনা, তা নিয়ে অনেক বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু সন্দেহ নেই ব্যঞ্জন শিল্প। শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত মধ্যযুগের ব্যঞ্জনের বিশেষ নিজস্বতা আছে। সুদূর মধ্যযুগের নিভৃত পল্লীতে পল্লীতে রমণীর সে শিল্পকলা এক হারিয়ে যাওয়া যুগ পরিবেশকে স্মরণ করায়। একালের হোটেলের রন্ধনে সেরকম স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, পালনীয় আচার-সংস্কার এবং রীতিনীতি পালনের রেওয়াজ নেই। সেকালে ছিল। মধ্যযুগের এক বিশেষ পরিবেশে ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার লালিত বাঙালির রন্ধনশিল্প। বাঙালির ব্যঞ্জন মধ্যযুগের বিশিষ্ট লোকশিল্প, যেগুলির অনেক অংশ গেছে হারিয়ে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ রন্ধনশিল্পকে খাদ্যশিল্প বলে অভিহিত করেছেন। লেখক তাঁর গ্রন্থের 'খাদ্যশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন- "পূর্বকালে বড় বড় ভোজে ব্যবহার্য নৈপুণ্যোদ্‌ভাবিত খাদ্য-বিশেষ 'খাদ্যশিল্প' নামেই অভিহিত হইতে পারে, অতএব আমরা এই শ্রেণীর শিল্পকে 'খাদ্যশিল্প' নামেই নির্দেশ করিলাম"। [১]

রন্ধনশিল্পে সমকালের রীতি-নীতি এবং রন্ধনকালের পালনীয় আচার সংস্কার বিশেষত শিল্পকলা- প্রকৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে পাকবিদ্যাকে শিল্পকলার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। লেখক লিখেছেন----------

> "বাৎস্যায়নের কামসূত্রে এবং তাহার টীকায় এই বিদ্যা চতুঃষষ্ঠিকলার অন্যতম বলিয়া কথিত হইয়াছে। শিল্পেরই অংশ-বিশেষ কলা নামে পরিচিত"। [২]

সেকালে বিদ্যাশিক্ষার অংশ হিসাবে পাকবিদ্যাকে ধরা হত। মহাভারতের ভীম সেন পাচক ছিলেন। তিনি বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতে পারতেন। বিরাট পর্বে মহাভারতকার লিখেছেন-

"উপস্থাস্যামি রাজানং বিরাটমিতি মে মতিঃ ।। ১।।
সূপনস্য করিষ্যামি কুশলোহস্মি মহানসে।
কৃৎপূর্ব্বাণি যৈরস্য ব্যঞ্জনানি সুশিক্ষিতৈঃ
তানপ্যভিভবিষ্যামি প্রীতিং সংজনয়ন্নহম্"।[৩]

অর্থাৎ- "আমি পাকগৃহের কার্য্যে নিপুণ আছি বলিয়া বিরাট রাজার ডাল ও তরিতরকারি প্রভৃতি পাক করিব এবং অন্য যে সকল সুশিক্ষিত পাচকেরা উহার ব্যঞ্জন (বিরাটের জন্য) প্রস্তুত করিয়া থাকে, আমি তাহাদিগকে পরাভূত করিব"। [৪]

মধ্যযুগের বাঙালি রমণীরা পাকবিদ্যায় শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় রেখেছেন। বাঙলার পল্লীতে পল্লীতে এমন রমণীর সন্ধান মেলে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী দুর্গা, ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা এমন রমণীরা সকলেই রন্ধন কুশলী। এঁরা রন্ধন কর্মে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মধ্যযুগে রন্ধনশিল্প এদের নিজস্ব শিল্প হয়ে উঠেছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পাতায় পাতায় এমন শিল্পের বিস্তৃত পরিচয় মেলে।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে জানা যায়, সেকালে রন্ধনশিল্পীরা নানা কৌশলে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত করতেন।এমনকি ভক্ষণকালে গ্রহীতাদের 'আকালিক বস্তু' অর্থাৎ অন্য ঋতুর ফল-শাক প্রভৃতি বলে ভ্রম হত। গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর 'প্রাচীন শিল্প পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন-

"সুতরাং ইহা হইতে প্রতিভাত হয় যে, তত্তৎ বস্তুর উপাদানের সংযোজন এবং বিশ্লেষণ বিষয়ে সেকালের শিল্পীদিগের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

অনেক সংযোজনয়া তথাকৃতে-
র্নিকৃত্য নিষ্পিষ্য চ তাদৃগর্জনাৎ।
অমীকৃতাকালিক বস্তুবিস্ময়ং
জনা বহুব্যঞ্জনমভ্যবাহরন্।।

সূপাকার- শাস্ত্রে সুপণ্ডিত পাচকবর্গের উদ্‌ভাবিত বিচিত্র ভোজ্যবস্তু খাইয়া, বরযাত্রিকগণ নিতান্তই ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ- তাঁহারা পাচকদিগের শিল্প-রহস্যোদ্ঘাটনে অসামর্থ্য বশতঃ নিরামিষ খাদ্যকে আমিষ বলিয়া বুঝিয়েছিলেন, পক্ষান্তরে আমিষগুলিকে নিরামিষ মনে করিয়াছিলেন"।[৫] সেকালে 'লাড্ডুক' বা লাড়ু প্রস্তুত হত। নিরামিষ ব্যঞ্জন তো বটে, আমিষেরও নানা শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ করেছেন গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয় তাঁর গ্রন্থে। লেখক সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে লিখেছেন-

"আরাধি ষন্মীন মৃগাজপত্রিজৈঃ
পলৈর্মৃদুস্বাদসুগন্ধি – তেমনং ।
অশাকিলোকৈঃ কুতএব জেমিতুং
ন তত্তু সংখ্যাতুমপি স্ম শক্যতে।। ৫৫/৮৭

ইহার অর্থ- নানাপ্রকার মৎস্য হরিণ ছাগ ও পক্ষীর মাংসের দ্বারা সূক্ষ্ম সুস্বাদ এবং সুগন্ধি এত অধিক রকমের ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হইয়াছিল যে, লোকে তাহা খাইয়া শেষ করা ত দূরের কথা, কেহ তাহার সংখ্যা করিতেও সমর্থ হয় নাই। এস্থলে মৎস্য-মাংস পাকের বাহুল্য এবং পরিপাট্য বর্ণনায় কবির গৌড়ীয়তা অনেকটা ফুটিয়া উঠিয়াছে"।[৬]

কবিকঙ্কণের কাব্য রন্ধনশিল্পে টইটম্বুর। এত বিচিত্র রকমের ব্যঞ্জনের পরিচয় কবির কাব্যে ধরা পড়েছে যে, মধ্যযুগের ব্যঞ্জনশিল্পের একটি পরিপূর্ণ অবয়ব উঠে আসে এবং তা পৃথক গবেষণার দাবী রাখে। মুকুন্দরামের কাব্যের আখেটিক খণ্ডে অনার্য রন্ধনশিল্পের পরিচয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রন্ধনে এসেছে সংস্কার ও সামাজিক রীতি-নীতি। সাধারণ এবং গর্ভবতী নারীর সাধভক্ষণের পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। কাব্যে অনার্য ব্যাধ সমাজের মিষ্টান্ন ও রন্ধনের তালিকা নিম্নরূপ-

১) মহিষের দই (পৃঃ ৩৯) ২)মিঠা ঘোল (পৃঃ ৩৯) ৩)চালতার ঝোল (পৃঃ ৩৯) ৪)ইচিঙ্গা-চালতা ও গিমার ব্যঞ্জন (পৃঃ ৩৯) ৫) সাঁতলে পলতার শাক রন্ধন (পৃঃ ৩৯) ৬) পুঁই ডগা, থুপি কচু এবং ফুলবড়ি দিয়ে মরিচের ঝাল (পৃঃ ৩৯) ৭) বেশি

লবণ সংযোগে নেউল ও গোধিকা পোড়া (পৃঃ ৪০) ৮) বোড়া সংযোগে হাঁস ডিমের বোড়া (পৃঃ ৪০) ৯) চিঙড়ির বোড়া (পৃঃ ৪০) ১০) সজারুর শিক পোড়া (পৃঃ ৪০) ১১) মুলা-বেগুন,সিম,নিম এবং ডমুর ফলের তিত (পৃঃ ৪০)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [৭]

উপরিউক্ত ব্যঞ্জন কোন বিলাসবহুল গ্র্যান্ড হোটেল কিংবা একালের রাস্তার ধাবায় পাওয়া যাবে না। কিংবা পাওয়া যাবে না, কোন বিলেতি রন্ধন বিষয়ক শিল্প কলার বইয়ে। একালের একান্নবর্তী কসমোপলিটন শহরের ফ্ল্যাট নিবাসিনী রমণীর রান্নায় এরকম মধ্যযুগীয় স্বাদ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বোধ, শুচিতা কিংবা রন্ধনের রীতি প্রণালী খুঁজে পাওয়া যাবে না।

নিদয়া গর্ভধারণ করেছেন। রন্ধনে এসেছে লোকাচার এবং সংস্কার। সাধভক্ষণের এই সংস্কার মুকুন্দরামের বাস্তবতার এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। নিদয়ার গর্ভসঞ্চার কালের প্রস্তুত ব্যঞ্জন এরকম-

“নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই
কুলি করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আঁমসি।
আমার সাধের সীমা ইচিঙ্গা পলতা গিমা
বোআলি ঘঁটিয়া কর পাক
ঘন কাঠি ঘর জ্বালে সান্তলিবে কটু তৈলে
দিবে তায় পলতার শাক।
পুই ডগি থুপি কচু ফুলবড়ি দিবে কীছু
দিবে তায় মরিচের ঝাল
হরিদ্রারঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল।
লোন কিছু দিবে বাড়া নেউল গোধিকা পোড়া

হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া
কীছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া
সসারু করহ শিকপড়া।
মুলাতে বার্তাকু সিম তাহে দিআ রান্ধ নিম
আর দেহ ডম্বুরের ফল"।[৮]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নায়িকা ফুল্লরা। তিনি অনার্য রমণী। তাঁর রন্ধন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আধারে গড়ে ওঠে নি। তাঁর খাদ্য তালিকায় দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট। ফুল্লরার খাবার দাবার এবং রন্ধনের তালিকা নিম্নরূপ-
১) আমানি (পৃঃ ৪৫) ২) খুদ জাউ (পৃঃ ৪৫) ৩) লাউ মেশানো সুপ (পৃঃ ৪৫) ৪)আলু ও ওলপড়া(পৃঃ ৪৬) ৫) কচু ঘন্ট-করঞ্জা-আমড়ার ব্যঞ্জন (পৃঃ ৪৬) ৬) দধি (পৃঃ ৪৬)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][৯]

আরণ্যক অনার্য মানুষের ব্যঞ্জন-সংস্কৃতি ধরা পড়েছে ফুল্লরার রন্ধনে।কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি কচু ঘন্টে মিশা করঞ্জা আমড়া"।[১০]

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলিতে দেখা যাচ্ছে, নিদয়া সাধভক্ষণ করেছেন তিত, ঝাল, ঝোল, নেউল, গোধিকা পোড়া এবং শিকপোড়ার মাংস দিয়ে। মধ্যযুগে তখন আরণ্যক ব্যাধেদের রন্ধন ততখানি পরিশীলিত হয়ে ওঠেনি। উচ্চবর্ণীয় হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে কিছুক্ষেত্রে পার্থক্য থেকে গেছে। ব্রাত্য প্রান্তিক অনার্য অধিবাসীদের রন্ধন, তাদের বিশ্বাস সংস্কার, রীতি-নীতি প্রতিফলিত হয়েছে কবিকঙ্কণের কাব্যে। ফুল্লরার তৈরি ব্যঞ্জনের মধ্যেও আরণ্যক দরিদ্র মানুষের উপল ব্যথিত বেদনার শতকিয়া ফুটিয়ে তুলেছেন মুকুন্দরাম।

কবিকঙ্কণ তাঁর কাব্যে আর্য রন্ধনের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু-সংস্কৃতি এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারক মানুষদের পরিশীলিত রুচির ছাপ পাওয়া যাচ্ছে আখেটিক খণ্ডের অন্তর্গত দেবী দুর্গার রন্ধন কলায়।এই শ্রেণীর রন্ধনকে S.C. Bose তাঁর গ্রন্থে 'culinary art' বলেছেন। তিনি লিখেছেন-'As fish is not acceptable to Doorga, neither cooked goat's and sheep's flesh, a separate kitchen is set apart for the purpose of cooking meat of sacrificed annimals. Brahmin women, as a rule, cook remarkably. Their long experience in the culinary art, their habitual cleanliness, their undivided attention to their duty, and above all, the religious awe with which they prepare food for the goddess, give quite a relish to every thing they make".[১১] 'আখেটিক খণ্ডে' দেবী দুর্গার রন্ধনের মধ্যে আর্য সংস্কৃতির পরিচয় স্পষ্ট। কবিকঙ্কণের কাব্যে দেবী দুর্গার প্রস্তুত ব্যঞ্জন নিম্নরূপ-

১) নিম শিম বেগুনের তিত (পৃঃ ২৬) ২) কুমড়া বেগুনের শুকতা (পৃঃ ২৬) ৩) কাঁঠাল বিচি, ফুলবড়ি, সরিষার শাক এবং বাথুয়া শাকের রন্ধন (পৃঃ ২৬) ৪) মুসুরি সুপ (পৃঃ ২৬) ৫) করঞ্জার ফুল ও ফুলবড়ির রন্ধন (পৃঃ ২৬) ৬) ফুলবড়ি ভাজা (পৃঃ ২৬) ৭) ছোলার ডাল (পৃঃ ২৬) ৮) কুমড়ার বড়ি এবং কাঠাল বিচি সহ ছোলার ডাল (পৃঃ ২৬)

[উপরিউক্ত ব্যঞ্জনের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১২]

S.C. Bose তাঁর ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থে দুর্গাপূজার রন্ধন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন-

"In the house of the Brahmin, Khichree, rice, dhall, fish and vegetable curries, together with sweetmeats and sour milk, are given to the guests, chiefly in the day time during the three pooja days".[১৩]

দেবী দুর্গার ব্যঞ্জন রন্ধনের মধ্যেও রক্ষিত হয়েছে কুলীন সংস্কৃতি। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"আজি গণেশের মা রান্ধিবে মোর মত

নিমে শিমে বাগ্যনে রান্ধিআ দিবে তিত
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর
কুমুড়া বাগ্যন দিআ রান্ধিবে প্রচুর।
নটিআ কাঁঠাল বিচি সারি গোটা দশ
ফুলবড়ি দিহ তায় আর আদারস।
কড়াই করিয়া রান্ধ সরিসার শাক
কটু তৈলে বাথুআ করিবে দৃড় পাক।
রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিআ টাবাজল
খন্ডে মিসাইয়া রান্ধ করঞ্জার ফল।
ঘৃতে ভাজ্যা ফেলিবে খন্ডেতে ফুলবড়ি
চাঙা চোঙা করিয়া ভাজ্যা পেল বড়ি।
রান্ধিবে ছোলার ডালি দিবে তথি খন্ড
আলস্য তেজিয়া জাল দিবে দুই দন্ড।
মানের বেসারি দিআ তায় কুমুড়ার বড়ি
ভাজিয়া কাঠাল-বিচি দিবে দুই কুড়ি।
ঘৃত জীরা সান্তলনে রান্ধিবে পালঙ্গ
ঝাট স্নান কর গৌরী না কর বিলম্ব।
গোটা কাসন্দি তায় জামিরের রস
এবেলা আমার মত রান্ধ বেঞ্জন দশ"।[১৪]

ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে রন্ধনের শৌচাশৌচ বিবেচিত হয়। বিশেষ পরিবেশ অনুসারী রন্ধনের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে দেবী দুর্গার রন্ধনের মধ্যে। সময়োপযোগী এমন ব্যঞ্জন হোটেলের কারখানা ঘরে প্রস্তুত হয় না। মধ্যযুগের রন্ধনের পুরাতনী বিশেষত্ব একালের ব্যঞ্জনে পাওয়া যাবে না।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বণিকখণ্ড'-এ সেকালের অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতির পরিচয় যথাযথভাবে চিত্রিত করেছেন মুকুন্দরাম। বণিকখণ্ডের নায়িকা খুল্লনা। ধনপতি দত্তের দুই পত্নী- লহনা, খুল্লনা। দুই পত্নীই রন্ধন পটু। লহনা-খুল্লনার রন্ধনের

মধ্য থেকে সেকালের রন্ধনশালার বিচিত্র বৈচিত্র্য সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ফুটিয়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ। খুল্লনা সাধু ধনপতি দত্তকে নিম্নোক্ত ব্যঞ্জন দিয়ে সোনার থালায় খাবার পরিবেশন করেছেন-

[নিম্নোক্ত ব্যঞ্জনের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১৫]

১) শুকুতা (পৃঃ ১১৯) ২) ঝোল (পৃঃ ১১৯) ৩) ঘন্ট (শাকের ব্যঞ্জন, পৃঃ ১১৯) ৪) ঘি সংযোগে মীন মাংস এবং বড়ি (পৃঃ ১১৯) ৫) ভাজা (পৃঃ ১১৯) ৬) অম্বল (পৃঃ ১২০) ৭) কই ভাজা (পৃঃ ১১৯) ৮) পিঠা (পৃঃ ১২০)

কাব্য কাহিনীর আর এক পরবর্তী পর্যায়ে লহনা নিম্নরূপ ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন-

১) চিতলের কোল (পৃঃ ১৫০) ২) কুমড়া-বড়ি-আলু সংযোগে রুই মাছের ঝোল (পৃঃ ১৫০) ৩) ছোলার সুপ (পৃঃ ১৫০) ৪) কই মাছের ভাজা (পৃঃ ১৫০) ৫) শকুল মীন রসাল (আম শোলের টক,পৃঃ ১৫০) ৬) চিঙ্গড়ির বড়া (পৃঃ ১৫০) ৭) কুমড়ো ভাজা (পৃঃ ১৫০) ৮) রুই মুড়ার ব্যঞ্জন (পৃঃ ১৫০)।

[উপরিউক্ত ব্যঞ্জনের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১৬]

কাব্যের পরবর্তী অংশে লহনার নানা রন্ধনের পুনরায় উল্লেখ করেছেন কবিকঙ্কণ। লহনা যে সব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন সেগুলির মধ্যে লতা-পাতা এবং বনশাকের রন্ধনই প্রধান। কবিকঙ্কণ লহনার ব্যঞ্জনের পরিচয় দিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে-

১) লতা,পাতা,বনশাকের রন্ধন (হিঙ্গ, জিরা,মেথি সহযোগে, পৃঃ ২১৫) ২) শোল মাছের রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ৩) আমসী এবং আম সহযোগে মুসুরের সুপ (পৃঃ ২১৫) ৪) পাট,পালঙ্গ,নালিতা,পলতা শাকের রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ৫) 'সাজ্যাতা-পাজ্যাতা',বনপুই,হিনচা,কলসী,'ডানিকলা',কড়া শাকের রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ৬) 'মহরি সোলপ ধন্যা খিরপাই বেত' (পৃঃ ২১৫) ৭) 'পুই পুনকা কাঁচরা'র রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ৮) নরম কাঁকুড়ির ডগা,লাউ ডগার ব্যঞ্জন রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ৯)করলার ব্যঞ্জন রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ১০) ঘন্ট (পৃঃ ২১৫) ১১) নালিতার শাকের রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ১২) বাথুয়া শাকের রন্ধন (পৃঃ ২১৫) ১৩) চিতলের কোল (পৃঃ ২১৫) ১৪) রুই মাছ,কুমড়ো,বড়ি সংযোগে

আলুর ঝোল (পৃঃ ২১৫) ১৫) শোল মাছ দিয়ে আমের ঝোল (পৃঃ ২১৬) ১৬) পুঁটি মাছ ভাজা (পৃঃ ২১৬)।

[উপরিউক্ত লোকশিল্পের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [১৭]

সেকালে রন্ধনশালায় প্রবেশের পূর্বে রমণীরা স্নান করতেন, ঘটে সর্বমঙ্গলা পুজো করতেন। এবং দেবীকে নৈবেদ্য উপহার দিয়ে তবেই ব্যঞ্জন প্রস্তুত করতেন। অন্তঃপুর রমণীরা শৌচাশৌচ বিচার করে রন্ধন করতেন। কবিকঙ্কণ লহনার রন্ধন প্রসঙ্গে লিখেছেন-

"পূজা সাঙ্গ করি রামা দিল বিসর্জন
রন্ধন করিতে হইল লহনার ত্বরা
ঘৃতে জবজব রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুয়া করিল দৃঢ় পাক।
খণ্ড মুগের সুপ উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালা খানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিআ ঝোল।
রান্ধিল ছোলার সুপ দিআ তথি খন্ড
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গন্ডা দশ
মুঠ্যে নিঙ্গড়িআ তথি দিল আদারস
বদরি শকুল মীন রসাল মুসরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল- সফরী
কথোগুলি তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া
ছোট ছোট গোটা চারি ভাজিল কুমুড়া"।[১৮]

মধ্যযুগে ব্যঞ্জনরূপে শাকের বিশেষত্ব ছিল। বিশেষত গর্ভবতী খুল্লনা শাক এবং আমশোল সহযোগে 'সাধভক্ষণ' করতে চেয়েছেন। লহনা নানা শাক সহযোগে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন। প্রস্তুত করেছেন 'বদরি শকুল' অর্থাৎ কুল দিয়ে শোল মাছের রন্ধন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ঘৃতে জবজব রান্ধে নালিতার শাক
কটু তৈলে বাথুআ করিল দৃঢ় পাক।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিথলের কোল
রোহিত কুমুড়া-বড়ি আলু দিআ ঝোল।
বদরি শকুল মীন আম্রে মুসুরি
পন দুই ভাজে রামা সরল- সফরী।
পঞ্চাশ বেঞ্জন অন্ন করিল রন্ধন
থালায় ওদন বাটী ভরিআ বেঞ্জন।
সাধ খান খুল্লনা নারীজন"।।[১৯]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নায়িকার রন্ধন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মধ্যযুগের কাব্যের নায়িকারা রন্ধন পটু। বেশিরভাগ নায়িকাই শীলিত সমাজের অংশীদার। সামাজিক রীতি-নীতি, সংস্কার, স্নান এবং শৌচাশৌচ বিচার রন্ধনকলার সাধারণ নিয়মের অংশ।এগুলিকে মান্যতা দিতেন অন্তঃপুর রমণীরা। তাদের ব্যঞ্জন প্রস্তুতের মধ্যে মধ্যযুগের সময়, পরিবেশ এবং শুচি-স্নিগ্ধ শুদ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে। বণিকখণ্ডের নায়িকা খুল্লনার ব্যঞ্জন প্রস্তুতের তালিকা নিম্নরূপ-

১) বেগুন,কুমড়ো,কাঁচকলা,জিরা,মেথি সহযোগে শুক্তার রন্ধন(পৃ. ১৬০) ২) নটে শাক,চিংড়ি,কাঁঠাল বিচি,নলিতার শাক,বাথুয়া শাক এবং ফুলবড়ি ভেজে বিশেষ রন্ধন (পৃ. ১৬০) ৩) দুধ লাউ (পৃ. ১৬০) ৪) ইক্ষু রস এবং মুগ ডালের ব্যঞ্জন (পৃ. ১৬০) ৫) মরিচ গুঁড়া এবং আদা রস সংযোগে কৈ মাছের ব্যঞ্জন (পৃ. ১৬০) ৬)কই মাছের ভাজা(পৃ. ১৬০) ৭) চিতলের কোল (পৃ. ১৬০) ৮) মান বড়ি মরিচ সহযোগে কাতলা মাছের ঝোল (পৃ. ১৬০) ৯) হিলিঞ্চা শাকের ব্যঞ্জন (পৃ. ১৬০) ১০) চিঙ্গিড়ার বড়া (পৃ. ১৬০) ১১) আমশোল (পৃ. ১৬০) ১২) তেঁতুল সহযোগে পাকাল মাছের ব্যঞ্জন (পৃ. ১৬০) ১৩) খিরী (পৃ. ১৬০) ১৪) কলা-বড়া-মুগ-সাউলি সহযোগে খিরের পুলি (পৃ. ১৬০) ১৫) পিঠা (পৃ. ১৬০)

[উপরিউক্ত ব্যঞ্জনের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া] [২০]

খুল্লনা স্বামী ধনপতি দত্তের আদেশক্রমে দেবী সর্বমঙ্গলাকে স্মরণ করে রন্ধনশালায় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করছেন। অনুচরেরা উপকরণ জুগিয়ে দিচ্ছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

“বাগ্যন কুমুড়া কচা কাঁচকলা তাহে মোচা
বেসারি পিঠালি ঘন কাষ্ঠি
ঘৃতে সন্তলন তধি দিআ হিঙ্গু জিরা মেথি
শুক্তার রন্ধন পরিপাটি।
ঘৃতে ভাজে পলাকড়ি নট্যা সাকে ফুলবড়ি
চিঙ্গড়ি কাঁঠালবিচি দিআ
ঘৃতে নলিতার সাক কটু তৈলে বাথুয়া পাক
খণ্ডে পেলে ফুলবড়ি ভাজিয়া।
দুগ্ধ লাউ দিআ খণ্ড জ্বাল দিল দুই দণ্ড
সাঁতলন মহুরির বাসে
মুগসুপে ইক্ষুরস কই ভাজে গণ্ডা দশ
মরিচ গুড় দিআ আদারসে।
মুসুরিমিশ্রিত মাষ রান্ধে দিআ রসবাস
হিঙ্গ জীরা বাসে সুবাসিত
ভাজ্যা চিতলের কোল কাতলা মাছের ঝোল
মান বড়ি মরিচ ভূষিত।
বোদালি হিলিঞ্চা সাক কাঠি দিআ ঘন পাক
সান্তলন কৈল কটু তৈলে
করিআ কণ্টকহীন আম্রেতে শকুল মীন
খর লোন দিআ ঘন কাঠি ”।[২১]

বোঝা যায়, মধ্যযুগে বাঙালির রন্ধনশিল্প উচ্চতা স্পর্শ করেছিল। নানা ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে খুল্লনা স্বামী ধনপতি দত্তকে সোনার থালায় খেতে দিয়েছে। আর ধনপতির আহার গ্রহণেরও পারম্পর্য ফুটিয়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ। আহার্য গ্রহণেরও কিছু রীতি আছে।

স্তবস্তুতি, সান্ধ্যকালীন পূজা, শিবদেবতা স্মরণ, মুখ ধোওয়া, জগন্নাথ স্মরণ, জলপান, অবশেষে আহার্য সেবন। ভোজনের প্রক্রিয়া এরকম-

"প্রথমে সুক্তা ঝোল ঘণ্ট সাক সূপ
মীন মাংস ভোজনে আপনা বাসে ভূপ।
ঘৃতে জব জব খায় মীন মাংস বড়ি
বাদ কর‍্যা ভাজা কই খায় তিন কুড়ি।
অম্বল খাইআ পিলা জল ঘটী ঘটী
দধি খায় ফেনি তার করে মটমটী"।[২২]

খুল্লনার এমন স্বামীসুখ স্থায়ী হয় না। ধনপতি প্রবাসে, সুদূর সিংহলে। খুল্লনার জীবনে ঘটে গেছে বিপর্যয়। কুজ্ঝটিকা, ব্যাপ্ত আঁধার তাকে সমাজ কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত করেছে। লহনার ষড়যন্ত্রে তিনি অরণ্যে পরিত্যক্ত, ছাগল ছরিয়েছেন। তার চরিত্র এবং সতীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে। অবশেষে সন্দেহ মুক্তি এবং অগ্নি পরীক্ষার মাধ্যমে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা প্রমাণ করতে হয়েছে খুল্লনাকে। তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন। পুনরায় রন্ধনশালায় প্রবেশ করেছেন খুল্লনা। খুল্লনা যে সব ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ-

১) ঘি সহযোগে সাক-সুপ-ফুলবড়ি ভেজে রন্ধন (পৃ. ১৯০) ২) কই মাছের ভাজা (পৃ. ১৯০) ৩) মুগের ডাল (পৃ. ১৯০) ৪) চিতলের কোল (পৃ. ১৯০) ৫) রুই মাছ,কুমড়া বড়ি ও আলুর ঝোল (পৃ. ১৯০) ৬) আম- শোলের টক (পৃ. ১৯০) ৭) পুঁটি মাছ ভাজা (পৃ. ১৯০) ৮) চিঙ্গড়ার বোড়া (পৃ. ১৯০) ৯) কুমড়া ভাজা (পৃ. ১৯০)।

[উপরিউক্ত ব্যঞ্জনের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][২৩]

দেবী ভগবতীকে স্মরণ করে খুল্লনা রন্ধনশালায় প্রবেশ করেছেন। রন্ধনপ্রণালী কার্যের শৌচাশৌচ মেনেছেন তিনি। দাসী দুর্বলা রন্ধন উপকরণ যোগান দিচ্ছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"সাক সুপ রান্ধিআ ওলায় ফুলবড়ি
ঘৃত দিআ ভাজিল উত্তম পলাকড়ি।
কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে পণ দশ

মুঠ নিঙ্গাড়িআ তাহে দিল আদার রস।
খণ্ডে মুগের সুপে উভরে ডাবরে
আচ্ছাদন থালখানি দিলেন উপরে।
কটু তৈলে ভাজে রামা চিথলের কোল
রোহিত কুমুড়াবড়ি আলু দিআ ঝোল
বদরি সকুল মীনে রসাল মুসুরি
পণ দুই ভাজে রামা সরল-সফরী।
কথগুলা তোলে রামা চিঙ্গড়ার বড়া।
কচি কচি গোটা দশ ভাজিল কুমুড়া"।।[২৪]

খুল্লনা ব্যঞ্জন পরিবেশন করছেন। ব্যঞ্জনের সুবাসিত গন্ধে সমগ্র ঘর ভরপুর। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"প্রথমে সুকুতা ঝোল সুপ ঘণ্ট সাক
প্রশংসা করএ সভে রন্ধনের পাক।
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের বেঞ্জন
গন্ধে আমোদিত হইল সাধুর ভবন"।[২৫]

সেই সুদূর মধ্যযুগে অতিথি প্রিয় বাঙালির জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি, আহার্য সংগ্রহ, ব্যঞ্জন প্রস্তুত এবং ভক্ষণের সঙ্গে সিংহলের সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে গেছে। সিংহলে ভাত বাজারে বিকোচ্ছে, তেমনি হাটে বিকোচ্ছে সুপ, ঘণ্ট, পুরি, আলু বড়া, শুক্তার ঝোল, ক্ষীরপুলি, পদ্মচিনি, অমৃত মণ্ডা প্রভৃতি ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্ন। দেশকালের ব্যবধান, প্রকৃতি-পরিবেশ, রীতি-নীতি, শৌচাশৌচের পার্থক্য ঘটে গেছে দুই ভিন্ন জাতির সংস্কৃতির মধ্যে। দুই দেশের সংস্কৃতির আদান-প্রদান থাকলেও এই পার্থক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ধনা ক্ষেত্র জগন্নাথ বাজারে বিকায় ভাত
কোথাহ না শুনি হেন বোল
ত্রিসন্ধ্যা বিকায় হাটে সুপ ঘণ্ট পুরি ঘটে
আলু বড়া শুক্তার ঝোল"।[২৬]

আর্য-অনার্য রন্ধনশৈলী এবং নানা ব্যঞ্জনের পূর্ণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবিকঙ্কণ। বণিকখণ্ডের নায়িকা খুল্লনা শুধু ব্যঞ্জন প্রস্তুতই করেন না, তাঁর অতিথি আপ্যায়ন, ব্যঞ্জন পরিবেশন, স্বামী পরিচর্যা সবই মধ্যযুগের রন্ধনশিল্পের শীলিত ঘরানায় দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখের দাবি রাখে।

বাঙালির আতিথেয়তা ঐতিহ্যগত। পানসেবন আতিথেয়তার এক অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়। আহারের পর পানসেবন মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাম্বুল সেবনের পরিচয় আছে। দময়ন্তীর বিবাহ ভোজের পরিচয় প্রসঙ্গে গিরীশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ তাঁর গ্রন্থে উদ্ধৃতি সহযোগে লিখেছেন-

"মুখেনিধায় ক্রমুকং নলানুগৈ
রথৌ পর্ণালিরবেক্ষ্য বৃশ্চিকম্।
দমার্পিতান্ত-মুর্খবাস- নির্মিতং
ভয়াবিলৈঃ স্বভ্রম-হাসিতাখিলৈঃ"।[২৭]

লেখক আরও লিখেছেন- "আমরা প্রাচীন শিল্প পরিচয়ে শুষ্ক প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা কালক্ষেপ করিয়াছি। অধুনা দময়ন্তী বিবাহভোজের গৌড়প্রিয় অপূর্ব সুপক্ক মৎস্য-মাংসের এবং কৃত্রিম ফলমূলের রসাস্বা করিয়া মনোমুগ্ধকর তাম্বুল চর্বণের দ্বারা মুখশুদ্ধির পর চলুন বিশ্রাম করি"।[২৮]

তাম্বুল সেবনকে মুখশুদ্ধিও বলা হয়। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পূর-তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন"।[২৯]

সেকালের রন্ধন, ব্যঞ্জন প্রস্তুত, আহার এবং পানসেবনের পূর্ণ পরিচয় দিয়েছেন কবিকঙ্কণ। ব্যঞ্জন শিল্পের একটা যুগ ধীরে ধীরে অবসিত হচ্ছে। সেকালের ব্যঞ্জন একালে আর ঠিক সেভাবে পাওয়া যাবে না। একালে হাটে-বাজারে হোটেলের ঘরে প্রস্তুত ব্যঞ্জনে সেই শৌচাশৌচ এবং রীতি-নীতি-সংস্কার পালনের দায়বদ্ধতাও নেই। মধ্যযুগের ব্যঞ্জনশিল্প একান্তই মধ্যযুগের কলাশিল্প, তা লুপ্তপ্রায়। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প" প্রবন্ধে লিখেছেন- "এখন প্রত্যহ বেতনভোগী "ঠাকুর" রন্ধনের ভারপ্রাপ্ত হওয়াতে বাঙ্গালীর রন্ধনশিল্পের এই বৈচিত্র্য নষ্টপ্রায়

হইয়াছে। রন্ধনে ব্যঞ্জনের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে বই কমে নাই, কিন্তু তাহাতে রন্ধনশালার কিছুমাত্র উন্নতি পরিলক্ষিত হয় না, বরং সমধিক অবনতিই দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহস্থের আর্থিক সামর্থ্যের তারতম্য অনুসারে ব্যঞ্জনের সংখ্যার বাহুল্য বা হ্রাস হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল ব্যঞ্জনে রন্ধন-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না"।[৩০]

মিষ্টান্ন

মধ্যযুগের বাঙালির খাদ্যশিল্পের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মিষ্টান্ন এবং মিষ্টান্ন সম্পর্কিত শিল্প। মিষ্টি তৈরির সময় শিল্পীরা শুচিতা বজায় রাখেন। পূজা পার্বণ এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মিষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতজ সম্পদে পরিপূর্ণ কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশে খাদ্য শিল্পের নানা বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। ময়রা সম্প্রদায়ের শিল্পীরা মিষ্টি তৈরি করেন। অন্তঃপুর রমণীরা তাদের শিল্পজ্ঞান এবং সৌন্দর্যের পরিচয় রেখেছেন মিষ্টি তৈরিতে। শিশুকে মণ্ডা-মিঠাই দিয়ে ভোলানো বাঙালি মায়েরা কবে প্রথম আয়ত্ত করেছিল কে জানে? সমস্ত ছড়ায় ছেলে ভুলানোর জন্য বাঙালি মায়ের প্রচেষ্টার শেষ নেই। বাংলাদেশে মণ্ডা মিঠাই, পিঠে-পুলি, লাড়ু, মুড়ি মুড়কি, সন্দেশ, খই, মোয়া, তালগুড়, খেজুর গুড়, আখগুড়, চিনি, ক্ষীর এসব মিষ্টি মধ্যযুগের সাহিত্যের নানাস্থানে উল্লিখিত হয়েছে।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে মুড়কি, লাড়ু, চিনি, খই, মুড়ি প্রভৃতি খাদ্যশিল্পের উল্লেখ পৃথকভাবে আলোচনার দাবি রাখে। সেকালে ময়রা মুড়কি তৈরি করতেন। শিব ভিক্ষা যাত্রা করেছেন। অভাব সংসারে কলহ নিয়ে এসেছে। হর পার্বতীর কলহ সুবিদিত। তারা যেন মর্ত্যের দারিদ্র্য পীড়িত গৃহস্থের প্রতিনিধি। খইয়ের সঙ্গে গুড় মিশিয়ে উনুনে বিশেষভাবে লেড়ে চেড়ে ময়রা মুড়কি তৈরি করেন। শিব ভিক্ষায় মুড়কি পেয়েছেন। ময়রা দিয়েছেন মুড়কি। ভিক্ষায় পেয়েছেন খই। গণেশ কার্তিক দুই ভাই খই মুড়ি নিয়ে কলহ করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখেছেন-

"ময়রা মুড়কি দেই সূত্রধরে দেই খই
তামুলিতে দেই গুআ পান
দেখিয়া মুড়কি খই দুঁহে আইলা ধাওয়াধাই
কন্দল বাড়িল দুই ভাই"।[৩১]

কালকেতুর খাদ্যতালিকায় মিষ্টি, ঘি নেই। ফুল্লরার মাংস বিক্রি হয় না। অভাবে অনটনে সখীর বাড়িতে গেছেন তিনি। সখী সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। লক্ষণীয়, সেকালের পল্লী বাংলায় অভাব ছিল, ছিল দারিদ্র্য, তবু এক উদার সহানুভূতি ও প্রীতির পারস্পরিকতা প্রতিবেশীদের মধ্যে ছিল। শোষণ ছিল, ছিল অত্যাচার, তা সত্ত্বেও সখীদের মধ্যে ছিল নিবিড় ভালোবাসা, ছিল অন্তরের বন্ধন। সখী শিরে তেল দিয়ে করবী বেঁধে দিয়েছেন। আর দিয়েছেন আঁচল ভরে খই মুড়ি-

'আঁচল ভরিআ সই দিল খই মুড়ি'।[৩২]

সেকালে খই, মুড়ি এবং চিড়া ভাজতেন সূত্রধর বা ছুতারেরা। গুজরাট নগর পত্তনের কালে এসেছেন সূত্রধর বা ছুতারেরা। তারা বসতি স্থাপন করেছেন। তারা চিড়া কুটছেন,মুড়ি এবং খই ভাজছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

"ছুথার নগর মাঝে চিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে"।[৩৩]

বাংলাদেশের খুব জনপ্রিয় মিষ্টান্ন লাড়ু। ছোট ছেলেমেয়েদের মোয়া,লাড়ু দিয়ে ভোলানোর রীতি বাংলাদেশে বহুকাল ধরে প্রচলিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে লাড়ুর উল্লেখ এসেছে নিম্নলিখিতভাবে-

১) লাড়ু (পৃ.১২৯) ২) লাড়ু (পৃ. ২০৮) ৩) লাড়ু (পৃ. ২৫৩)

[উপরিলিখিত মিষ্টান্নের পৃষ্ঠাসংখ্যাগুলি তথ্যসূত্রে উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে নেওয়া][৩৪]

সওদাগর ধনপতি দত্ত সিংহল রাজের রাজসভায় রাজভেট বা উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে গেছেন কলসী ভরে লাড়ু। লাড়ু নিয়ে যাওয়ার এই রীতি মুকুন্দরাম উল্লেখ করেছেন। কবিকঙ্কণ লিখেছেন-

কান্দি দশ লইল বাওন নারিকল
ঘড়ায় ভরিয়া চিনি লাড়ু গঙ্গাজল।[৩৫]

ময়রা লাড়ু তৈরি করেন। এক প্রজন্ম পরে ধনপতি দত্তের পুত্র সওদাগর শ্রীমন্ত সিংহলেশ্বরকে রাজভেট রূপে লাড়ু উপহার দিয়েছেন-

'সালি তণ্ডুল গছ বান্ধি নানা ফল খাসা দধি
চিনী ফেণী নাড়ু গঙ্গাজল'।[৩৬]

রাজভেট রূপে সেকালে যে চিনি, গঙ্গাজল এবং লাড়ুর ব্যবহার ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। কবিকঙ্কণ এর কাব্যে বার বার তা উল্লিখিত হয়েছে। কবিকঙ্কণ লিখেছেন- ' ঘড়ায় পুরিআ চিনি লাড়ু গঙ্গাজল'।[৩৭]

বাস্তবিকই সেকালের বিশেষ বিশেষ লোকশিল্পী সম্প্রদায় এবং বাংলার অন্তঃপুর রমণীরা যথার্থ শিল্প গৌরবের অধিকারী ছিলেন। সেকালে নববিবাহিত জামাতাকে এমন অন্তঃপুর শিল্পী রমণীরা কৃত্রিম খাদ্য তৈরি করে বিশেষভাবে ঠকিয়ে কৌতুক অনুভব করতেন। শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় 'বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প' প্রবন্ধে লিখেছেন- "ওই সকল কৃত্রিম খাদ্য নির্মাণে বঙ্গ-রমণীর বিশেষ দক্ষতা ও শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা কোনও সম্ভ্রান্ত পুরমহিলার দ্বারা প্রস্তুত শোলার মুড়ি দেখিয়াছি, সেই মুড়ি দেখিতে এত স্বাভাবিক যে হাতে করিয়াও তাহা কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। ছোট ছোট সোলার টুকরাকে এমনি কৌশল সহকারে কাটা হয়। এই সোলার মুড়ি নির্মাণে সাধারণত তীক্ষ্মধার বঁটি ব্যতীত অন্য কোনও অস্ত্রই ব্যবহৃত হয় না"।[৩৮]

কবিকঙ্কণের কাব্যে শিউলী সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। শিউলী খেজুর গাছের রস থেকে গুড় প্রস্তুত করেন। গুজরাট নগরে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতো শিউলীরা বসতি স্থাপন করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী লিখেছেন-

"শিউলী নিবসে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে"।[৩৯]

মুকুন্দের কাব্য নানা শিল্পে টইটম্বুর। ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন এবং খাদ্যশিল্প তার মধ্যে অন্যতম। এসব শিল্পের মধ্যে সেকালের রুচি, জীবনবোধ এবং সংস্কৃতির ছাপ বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। কৌশিক দাশগুপ্ত তাঁর 'বাসনার সেরা বাসা রসনা : মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল' প্রবন্ধে লিখেছেন – "আসলে কবিকঙ্কণ এখানে উপস্থাপন করেছেন কৌম জনগোষ্ঠীর ভোজন তালিকা। সেখানে বৈচিত্রের অভাব ও পরিমাণের বিপুলতা স্বাভাবিক"। [৩৯(ক)]

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকে সংকলিত 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' গ্রন্থে বাঙালির খাদ্যতালিকার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে । কান্তা (স্ত্রী) রাঁধছেন-বাড়ছেন, পুণ্যবান (স্বামী) খাচ্ছেন। কেমন সেই রান্না?------ ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘি, ময়না মাছ, নলিতা শাক। প্রাকৃত-পৈঙ্গলের কবি লিখেছেন------

"ওগগর ভত্তা / রম্ভঅ পত্তা।

গায়িক ঘিত্তা/ দুগ্ধ সজুত্তা।

মোইলি মচ্ছা/নালিচ গচ্চা।

দিজ্জই কন্তা / খাঅ পুণ্যবন্তা।"[৪০]

সেই কোনকালে, এক সের ঘি দিয়ে কুড়িটি মণ্ডা বানানোর কথাও বলা আছে প্রাকৃত-পৈঙ্গলে----------

'সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা

মণ্ডা বীস পাকাইল ণিত্তা।'[৪১]

ব্যঞ্জন যে উৎকৃষ্ট লেখনীর উৎস হতে পারে রবীন্দ্রনাথ তা দেখিয়েছেন। ব্যক্তির স্পষ্ট ভাষার সঙ্গে বিচিত্র সাদা রঙের মিষ্টান্নের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যকে তুলনীয় করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রহাসিনী' কাব্যের 'রঙ্গ' কবিতায় লিখেছেন------

"ক্ষীর সাদা, নবনী সাদা, সাদা মালাই রাবড়ি

তাহার অধিক সাদা তোমার স্পষ্ট ভাষার দাবড়ি। [৪২]

ঠাকুরবাড়িতে বাঙালি রান্নার ধারা কিছুটা বজায় ছিল। চিত্রা দেব তাঁর 'ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল' গ্রন্থে লিখেছেন—"তাঁদের বাড়িতে রোজকার ব্যঞ্জন ছিল—'ডাল - মাছের ঝোল-অম্বল, অম্বল-মাছের ঝোল- ডাল। বাস্তবিকই রান্না এবং রান্নাঘর নিয়ে, কেতাবী ভাষায় রন্ধনতত্ত্ব ও রন্ধনবিদ্যা নিয়ে তিনি (রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুপুত্রী প্রজ্ঞা) যত মাথা ঘামিয়েছেন, তত চিন্তা আর কোনও মহিলা করেছেন বলে মনে হয় না।" [৪৩]

শীলিত রবীন্দ্রনাথ কালকেতুর ভোজনকে স্বাভাবিক উদারতায় গ্রহণ করতে পারেন নি। কবি লিখেছেন- "কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের যে বর্ণনা আছে-সে এক-এক গ্রাসে এক এক তাল গিলছে, তার ভোজন উৎকট।" [৪৪]

মুকুন্দরামের কবিতায় আবহমান কালের ভোজনপ্রিয় বাঙালি নানা রেখায় চিত্রিত। জীবনরস রসিকতা তাঁর খাদ্য তালিকাতে সহজেই মেলে। গভীর আসক্তির সঙ্গে তার কাব্যের নর-নারীরা জীবন পিপাসু হয়ে উঠেছে। ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্ন সেই জীবনী শক্তির পরিচয় দেয়। আর আস্বাদপ্রিয় বাঙালির ব্যঞ্জন এবং রন্ধনকে অবলম্বন করে

কবির কবিত্ব শক্তি বাস্তবের গভীরে শেকড় চালিত করে সৃষ্টির রস সন্ধান করেছে। রবীন্দ্রনাথের কথায়-

"অতএব মাংসাশী প্রাণীর লোভ এড়াইতে যদি ইচ্ছা থাকে, তবে মাংসাশী হওয়া আবশ্যক।" [৪৫]

তথ্যসূত্র

১. বেদান্ততীর্থ, গিরিশচন্দ্র, প্রাচীন শিল্প পরিচয়,খাদ্যশিল্প (প্রবন্ধ), সুবর্ণরেখা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃঃ ১৭১

২. পূর্বোক্ত, পাকবিদ্যা, পৃঃ-৮৭

৩. বেদব্যাস, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মহাভারতম্ (বিরাট পর্ব্ব), দ্বিতীয় অধ্যায়, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃঃ-১১

৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ-১১

৫. বেদান্ততীর্থ, গিরিশচন্দ্র,প্রাচীন শিল্প পরিচয়,খাদ্যশিল্প (প্রবন্ধ), সুবর্ণরেখা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃঃ ১৭৩

৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ-১৭৩

৭. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ- ৩৯, ৪০

৯. পূর্বোক্ত

১০. পূর্বোক্ত, পৃঃ-৪৬

১১. Bose, Shib Chunder (S.C. Bose), The Doorga Poojah Festivel, 'The Hindoos as they are' (Book), A description of the manners, customs and Inner life of Hindoos Society in Bengal, London: Edward Stanford, 55, Charing Cross, Calcutta, W.Newman and Co. 3, Dalhousie Quare, 1881, Puja Festival, PP.-115

১২. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩

১৩. Bose, Shib Chunder (S.C. Bose), The Doorga Poojah Festivel, 'The Hindoos as they are' (Book), A description of the manners, customs and Inner life of Hindoos Society in Bengal, London: Edward Stanford, 55, Charing Cross, Calcutta, W.Newman and Co. 3,Dalhousie Quare, 1881, Puja Festival, PP.-114

১৪. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ২৬
১৫. পূর্বোক্ত
১৬. পূর্বোক্ত
১৭. পূর্বোক্ত
১৮. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৫০
১৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২১৫, ২১৬
২০. পূর্বোক্ত
২১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০
২২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১
২৩. পূর্বোক্ত
২৪. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯০
২৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৯১
২৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৪৪
২৭. বেদান্ততীর্থ, গিরিশচন্দ্র,প্রাচীন শিল্প পরিচয়,খাদ্যশিল্প (প্রবন্ধ),সুবর্ণরেখা, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃঃ ১৭৩
২৮. তদেব
২৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ১৯১
৩০. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার, বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প, প্রবাসী, ৫ ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৯, পৃঃ ৬৮৮-৬৮৯, সম্পাদক-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়
৩১. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ২৬
৩২. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৫
৩৩. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৮৩
৩৪. পূর্বোক্ত
৩৫. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১২৯
৩৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২০৮
৩৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৫৩

৩৮. চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযোগেন্দ্রকুমার, বঙ্গের অন্তঃপুরশিল্প,প্রবাসী, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৯, পৃঃ ৬৮৮, সম্পাদক-রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

৩৯. চক্রবর্তী, মুকুন্দরাম, চণ্ডীমঙ্গল, সেন, সুকুমার (সম্পাদিত), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি, ষষ্ঠ মুদ্রণ-২০১৩, পৃঃ ৮৩

৩৯. (ক) দাশগুপ্ত, কৌশিক, বাসনার সেরা বাসা রসনা : মুকুন্দের অভয়ামঙ্গল, এবং মাহুয়া (পত্রিকা), ২১ তম বর্ষ, ১১৪ সংখ্যা, ২০১৯, সম্পা. ড. মদনমোহন বেরা, মেদিনীপুর, পৃ: ১৭২

৪০. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৫, পৃঃ ১১৭

৪১) সেন, শ্রীসুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০১, পৃঃ-৫০

৪২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রঙ্গ, প্রহাসিনী, রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃঃ১২

৪৩) দেব, চিত্রা, ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহল, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১১, পৃঃ- ৭৪

৪৪) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাপান যাত্রী, রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪০২, পৃঃ৪১৫

৪৫) পূর্বোক্ত, চতুর্দশ খণ্ড, দয়ালু মাংসাশী, বিবিধ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৬৮